Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.121-129
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে সূফীদের ভূমিকা

সেখ সুজাউদ্দিন
প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The world of Sufism revolves around Ishq. In that world, the relationship of human love with Allah is the main subject of Sufism. From this basic idea, human love and improvement of human soul were the main living issues among the Sufis. In this context, the social contribution of Sufis can be witnessed. Starting from the 11th century, the Sufis who came to Bengal conducted various social activities around their khanqah and mazar e sharifs. The contribution of Sufis in education, health and improving the quality of life adds a new chapter to the religious and social history of Bengal. Sufi believes that "doing good and making people do good things is called Jihad. Refraining one from all evil and making people restraining is called Jihad".

Keyword: Sufism, Bengal Society, Social reconciliation, spiritual life, Humanity.

সমাজ একমুখী হয়ে চিরকাল চলবে এ হওয়ার নয়। নব ভাবনার উৎপত্তি ও বিকাশ হবে , আদিকাল থেকে প্রকৃতির এই নিয়ম চলে আসছে। আরব দেশের ইসলামিক ভাবের মধ্যে অঙ্কুরিত হওয়া সূফীবাদ প্রস্ফুটিত হতে হতে পারস্য উপমহাদেশে ছাড়িয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এক সুবিস্তৃত বাগান তৈরি করতে সক্ষম হয়।[1] ভারতে মুসলমান শাসনের আগমনের প্রারম্ভিক কাল থেকে যেসকল নব ভাবনা এদেশের সমাজ ধর্ম সংস্কৃতিকে আলোড়িত করেছে তার মধ্যে সূফী ভাবধারা প্রধান ও বহু আলোচিত বিষয়। সূফীর চোখে মানবের উন্নতির যে লক্ষ্য তা শুধুমাত্র আত্মিক- পারোলৌকিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কালের প্রেক্ষাপটে জাগতিক বা বাহ্যিক উন্নতিও ছিল তাদের লক্ষ্য। এক শক্তিশালী শাসক কোন স্থানে প্রবল ক্ষমতা প্রয়োগেও হয়ত সেই স্থান দখল করতে সক্ষম হন না কিন্তু এক্ষেত্রে সূফীগণ সেই অংশের ভূমি নয় বরং মানুষ ও মানুষের হৃদয়কে জয় করেছিলেন।। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মেলবন্ধনের সহজ সরল পথ মানুষকে চৌম্বকের মতে আকর্ষণ করতে শুরু করল। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমাজে এই সম্মোহন দারুণভাবে কাজ করেছিল । এই ধর্মীয়- দার্শনিক তত্ত্বের মূল ভাবনার সাথে মিশেছিল এক সু-সামাজিক ভাবনা। W .A.Friedlander তাঁর 'Introduction to social welfare ' গ্রন্থে বলেন - ' সমাজকল্যাণ হল সমাজসেবা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এমন এক সংগঠিত পদ্ধতি যা ব্যাক্তি ও দলকে সন্তোষজনক স্বাস্থ্য ও জীবনমান লাভ এবং ব্যাক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক অর্জনে সহায়তা করে যা তাদের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম করে তোলে'।[2] সমাজবিজ্ঞানের এই সূত্রে সুফিবাদের সমাজভাবনা যথেষ্ট পরিপক্ক রূপ লাভ করতে পেরেছিল।
কানু ফকির বিরচিত আগমের 'চার মঞ্জিল' এ উঠে আসে –

"... প্রথমে রিজিক হএ 'পবন' উত্তম
দ্বিতীএ রসনা হন্তে 'সুধা' যে মধ্যম।

'অন্ন জল ' তৃতীএ অধম বস্তু হএ
এতিন আহার সর্ব জীবনে করএ ।…"

বিগত কয়েক দশক ধরে অবিভক্ত বাংলার সূফীবাদ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হলেও বঙ্গীয় সূফীদের ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়নি বললেই চলে। এতদ্বসত্ত্বেও যা তথ্য প্রমাণ মেলে তা সূফীবাদের ধর্ম-কর্ম কে বিশদভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। ভারতে প্রবেশ করে উত্তর ভারতের রূপ রস গন্ধ নিয়ে এই ভাবনা বাংলার মাটিতে মেশে। মধ্যযুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস যেমন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে অনুরূপভাবেই উত্তর ভারতের বিস্ফোরিত সূফীবাদ বাংলা কে প্রভাবিত করেছে। এই ধারার বিখ্যাত গবেষক মহম্মদ এনামুল হকের মতে ভারতে সুফী ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা পর্যায় ছিল ১১৫০খ্রি: থেকে ১৪০০ খ্রি:।[1] এই পর্বের উত্তর ভারতীয় সূফীদের সমাজ সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার সাথে বঙ্গীয় ধ্যান ধারণার ব্যাপক অন্তর পরিলক্ষিত হয় না, যতটুকু স্বতন্ত্রতা দেখা যায় তা স্থানীয় পরিবেশ,পরিস্থিতি, রীতিনীতি , ধ্যান-ধারণার স্বাভাবিক প্রভাবের ফল। ড: ওসমান গনী তাঁর কাব্যকাননে এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

" আসিতেছে রাত্রিদিন যত শিশুদল -
তারা যেন আকাশের বৃষ্টিবিন্দু জল ।
এই দল, এই জল মানবের ধারা
মিলনের মোহনাতে হবে না হারা ।…"

'এহসান ই তাকভীম' অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে তৈরি করেছেন। মানবকূল ' আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ বিশ্ব সেরা জীব।[3] এই দৃষ্টিকোণ থেকে সূফীবাদে মানব ও মানবসমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। উদারতা, মানবপ্রীতি ও নৈতিকতা সূফীদের মূল মন্ত্র। তাদের কোনো ভাগ্যান্বেষণ বা উচ্চাকাঙ্খার অভিলাষ দেখা যায়নি। শুধুমাত্র বাংলার সূফীসাধক নয় অধিকাংশ সূফীসাধকদের জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তারা অত্যন্ত প্রত্যন্ত স্থানে আস্তানা গড়ে তুলেছেন। গৌড় পান্ডুয়ার জালাল তাব্রিজি থেকে শুরু করে বীরভূমের মখদুম শাহ অথবা নেত্রকোনার শাহ সুলতান রুমির মাজার তার প্রমাণ দেয়। সূফী সাধকদের ধ্যান-ধারণা রাজ প্রশাসকদেরও প্রভাবিত করে। সেই সূত্রে সম্রাটরা সূফীদের সম্মান প্রদর্শনে নিষ্কর ভূমি প্রদান করতেন ।মালদহে সুলতান শাহ জালালুদ্দিন তাব্রিজিকে খানকা তৈরীর জন্য 22 হাজার বিঘা সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন যা 22000 এস্টেট নামে পরিচিত। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কেতুগ্রামে হযরত শাহ গরিব হোসেনের উদ্দেশ্যে সুলতান হোসেন শাহ মসজিদ নির্মাণ করে দেন যার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃশ্যমান। সুলতান ইলিয়াস শাহ(১৩৩৯ -১৩৫৮ খ্রি:), রুকুনউদ্দিন বারবাক শাহ (১৪৫৯ -১৪৭৮ খ্রি :), আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩ - ১৫১৯ খ্রি:) ও নুসরত শাহ (১৫১৯- ১৫৩২ খ্রি :) সকলেই সুফি সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন অর্থাৎ মুঘল সম্রাট আকবরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতির প্রতি আনুগত্য, সেলিম চিশতীর সান্নিধ্যে থাকা , জাহাঙ্গীরের খাজা বাবার প্রতি সম্মাননা , দারাশিকোর সূফী পথগামী হওয়া ও শাহজাহানের সূফী সান্নিধ্যের অনুরূপ চিত্র বাংলাতেও দেখা গিয়েছিল। সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক ১১২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীর মৌলানা শাহ হামিদ দানিশ মন্দের উত্তরাধিকারীকে মদদ-ই- মাশ(ধর্মীয় পটভূমি থাকা সাধকদের নিস্কর ভুমিদান) প্রদান করেন যা বর্তমানে রাজশাহী কালেক্টরিতে সংরক্ষিত আছে ।[4] গবেষক আব্দুল ওয়ালি হাসান মারিয়া বুরহানির উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে সনদ উদ্ধার করেন যেখানে হস্তান্তরিত কিছু সম্পত্তির উল্লেখ আছে। সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতাসহ নানান সাহায্য সূফীদের ক্রিয়া-কলাপকে আরও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। ওয়াহেদাতুল ওজুদ এবং ওয়াহেদাতুশ শুহুদ শব্দ অন্তরে রেখে সূফী সাধকরা দরিদ্রের সেবা, দান ধ্যান ও লঙ্গরখানা পরিচালনাতে নিয়োজিত

থাকতেন। খাজা মইনউদ্দিন চিশতির মালফুজাতে বর্ণিত আছে ----কেয়ামতের আজাব থেকে মুক্তি পেতে হলে দুঃস্থ বিপন্ন ও উৎপীড়িতদের খেদমত করতে হয়, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন এবং ক্ষুধার্তদের আহার প্রদান করতে হয়। তিনিই প্রকৃত আরেফ যিনি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খালি হাতে ফেরাননা। পাণ্ডুয়াই শাহ সূফী শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজির বাসস্থান ছাড়াও মাদ্রাসা, লঙ্গরখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও গ্রন্থাগার ইত্যাদি ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে তান্নুরখানা থেকে বহু মুসাফির অন্ন পেত। বীরভূমের খুস্তিগিরিতে শাহ আবদুল্লাহ কিরমানি মানবসেবায় খানকাহ, মাদ্রাসা, অতিথিশালা ও গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন।[5] পীর আবু বকর সিদ্দিকী বহু মানবিক প্রতিষ্ঠান যেমন অনাথ আশ্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার পুত্র আব্দুল কাহার সিদ্দিকী অনুরূপ সামাজিক কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন ।[6] সূফীরা ছিলেন অসহায়ের সাথী, দরিদ্র- সর্বহারাদের শরিক। সূফীরা আল্লাহর প্রেমে একমুখী হওয়ার জন্য সমস্ত বিষয় সম্পত্তি থেকে দূরে থাকতেন। তাঁরা মনে করতেন গরিব লোকের কিছুই নেই তার কোন ক্ষতি হয় না। কিছু না পেয়ে সে দুঃখী ও অসহায় হয়না। তাই কোন বিষয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনকে বিচলিত করে না। এই অবস্থাতেই মানুষ সহজেই আল্লাহর সন্নিকটে আসতে পারে। সূফী সেখ ইয়াহিয়া মুয়াদ আল-রাজী, আবুল হাসান সিমুন, আবু সঈদ ফাদলাল্লা প্রমুখ ব্যক্তি এইরূপ ধারণা রাখতেন। দরিদ্রদের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ ও সমাজে তাদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় সূফী সাধকদের একটি দৃঢ় ভূমিকা ছিল। এই উদার ভাবনা, ভোগ, বিষয় আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বের দর্শন সামাজিক গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রচনা করে।

তুরস্কে থেকে বর্ধমানের পুরাতনচকে আসেন (বর্তমানে আলমগঞ্জ) পির সূফীসাধক শাহ বারদি বায়াত যিনি পরে বাহরাম সাক্কা (সাক্কা কথার অর্থ জল প্রদানকারী) নামে খ্যাত হন। জ্ঞানী এই ব্যক্তির কাছে বহু মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হতেন। বহু মানুষদেরকে তিনি জাগতিক সেবাসমূহ প্রদান করেন । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরি এবং মতওয়াল্লিগণ একই ভাবে এখনও দীন দুঃখীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।[7] এছাড়াও ঘটনা বিশেষে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সূফী সন্তদের জনহিতকর কার্যাবলীর পরিচয় মেলে। রাজশাহীর মহাকালগড়ের লোক প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী দেওরাজা কর্তৃক নরবলির প্রচলন ছিল । হযরত শাহ মখদুম রুপোশ জনমতের সাথে এই নরবলি বন্ধ করেন। Richard Maxwell Eton পূর্ববঙ্গে কৃষি সম্প্রসারনের এক তত্ত্বে দেখাচ্ছেন মুঘল আমলে কৃষি পণ্যের চাহিদা বাড়লে মুসলিম শাসক ও পির দরবেশেরা বনজঙ্গল কেটে নতুন বসতি গড়ে তোলেন ও কৃষি জমির সম্প্রসারণ করেন।[8] সুলতান বারবাক শাহের আমলে বন্যার কবল থেকে রাজধানী রক্ষার কাজে দরবেশ যোদ্ধা নামে খ্যাত শাহ ইসমাইল গাজী ব্রিজ নির্মাণে ভূমিকা রাখেন।

সাম্প্রতিককালে গবেষকগণ স্নায়ুবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে এবং মানসিক অসুস্থতা বোঝার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতাকে একটি থেরাপি পদ্ধতি হিসেবে দেখছেন। মানসিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আধ্যাত্মিকতার ভূমিকা স্বীকার্য হয়েছে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৩৭ তম World Health Assembly তে। পশ্চিমাবিশ্বের বেশ কিছু দেশে আধ্যাত্মিকতাকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'Psychiatry' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Psukhe' ও 'iatreia' থেকে এসেছে যার অর্থ আসে psyche বা soul ও healing বা নিরাময় যা সূফীবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাম্প্রতিক গবেষণায় Foskett দেখিয়েছেন ৪৫ শতাংশ মানসিক স্বাস্থ্য বিশারদ মনে করেন আধ্যাত্মিকতা মানসিক রোগ সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে কাজে আসতে পারে। মুরীদরা মুর্শিদদের হস্তক্ষেপে মনকে এককেন্দ্রিক করতে পারত। এই এককেন্দ্রিকতা ও বিশ্বাস ব্যক্তির মানসিক সমস্যা নিরসনে 'কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির' অনুরূপ সাহায্য করতে সক্ষম। যুগে যুগে বহু মানুষ মানসিক সমস্যা নিয়ে সূফী দরগায় হাজির হলে ইতিবাচক বিশ্বাস ও তার অভ্যাসের থেরাপিউটিক প্রক্রিয়া কাজ করে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হত। এছাড়াও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সূফী সাধকদের একটি ভূমিকা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও দীন দরিদ্রের চিকিৎসায় অনেক সূফী সাধক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যার মধ্যে জালাল উদ্দিন তাব্রিজি , শাহ আবদুল্লাহ কিরমানি ও আবুবকর সিদ্দিকী প্রমুখের নাম উঠে আসে।[9]

বাংলায় সূফীগনের আগমনের সময় কালকে এককথায় বৈষম্যহীন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সময়কাল বলা যায় না সুতরাং সূফীবাদ খুব সহজেই বাংলার মাটিতে ভিত্তি স্থাপন করেছিল একথা ঠিক নয়। এক দুর্গম পরিস্থিতিতে সুফিবাদের জীবনধারা, মুক্ত স্বাদ, প্রেম ও প্রীতির বাণী, যেকোনো ধরনের বৈষম্যহীনতা ও মানবসেবা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবল বন্যার ন্যায় বঙ্গীয় সমাজকে প্লাবিত করল। বহু মানুষের এই নব ভাবনার ছত্র ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল। ইসলামিক গোঁড়ামি নয় ওয়াহাদাতে ও আদয়ান এর কামনা লালসাহীন ধারণা বিস্তৃত হয়েছিল। সকল ধর্ম বর্ণের মানুষকে আপন করে নেওয়ার এই দর্শন ও মতবাদ আঞ্চলিক ভাবনার সাথে মিশে নতুন উদ্দীপনা তৈরী করল। সকল ধর্ম, জাতি ও শ্রেণীর পুণ্যতীর্থে পরিণত হল সূফীদের খানকাহ ও মাজারগুলি ।ভাবপ্রবন বাংলায় সূফীদের আগমনে সাধারণ মুসলিম শাস্ত্রীয় ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সূফীপন্থীদের চিন্তা ধারায় গা ভাসিয়েছিলেন। ড: এনামূল হক ইসলাম ধর্মের মধ্য থেকে এধরনের জন্মলাভ করা নতুন ইসলামকে বললেন লৌকিক ইসলাম। এরা স্রষ্টা, সৃষ্টি ও রহস্যময় মানবজীবনকে কেন্দ্র করে সহজ জীবন পথ বেছে নিলেন। এই প্রেক্ষাপটে তারা স্থানীয় রীতিনীতি দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হল। হিন্দু মুসলিম একে অপরের উৎসবে অংশ নিতে শুরু করে। আব্দুল কাহার সিদ্দিকী তার ওলি পিতার অমুসলিমদের প্রতি মনোভাবের বর্ণনা করেছেন :‘ পিতা বলেছেন চাঁদের আলো আর রোদ সকলের জন্য পাওয়া যায়। ধনী গরিব সকলের জন্য বাতাস বয়ে যায়। এগুলি কি ধর্ম জাতি হিসাবে বন্টিত হয় ? শস্য এবং মাছ কি মুসলিম ও অমুসলিম বিশেষে কম বেশি ভিন্নভাবে বন্টিত হয় ? ও মানব সকল মনে রেখো হিন্দু বুদ্ধ এবং অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে আমি তেমনই ব্যবহার করি, আল্লাহ যেমন তাদের সাথে ব্যবহার করেন। তার এই প্রকৃতি বহু বিধর্মীদের তার প্রতি আকর্ষিত করে। ‘ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রভাবশালী সূফী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নিসারউদ্দিন আহমেদ যিনি বাংলার দক্ষিণ অংশে এই নতুন ভাবের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তার অঞ্চলে বেশিরভাগ হিন্দ সম্প্রদায় বসবাস করতেন কিন্তু কোনো হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের প্রমান পাওয়া যায়নি। তিনি এই লৌকিক মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবতা ও সহানুভূতির চরিত্র রচনা করলেন। অর্থাৎ বলা যায় সূফী সাধকেরা আধ্যাত্মিক ও বাস্তব সমাজে হিন্দু- মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছিলেন। আজও তার ধারা সম্প্রীতির ধারা বিদ্যমান। এই ভাবমিশ্রন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে তীব্র উৎফুল্লতা লাভ করেছিল। ১৭ শতকের একজন চিশতী সূফী লেখক আব্দুর রহমান। তিনি সংস্কৃত জানতেন এবং গীতা অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ভবিষ্য পুরানের উপর ভিত্তি করে একটি রচনা করেন যা হিন্দু ও ইসলামিক ধারা গুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিল। তার মতে যা ভালো তা আমাদের প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে গ্রহণ করা উচিত। ‘আনো ভদ্র ক্রাতাভো ইয়ন্তু বিশ্বনাথ‘ - অর্থাৎ সমস্ত দিক থেকে মহান ভাবনা আমার কাছে আসুক ; (ঋগ্বেদ ; ১-৮৯-১) এর সাথে তাঁর সূফী ভাবনার মিল পাওয়া যায়। পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কালান্দারি সূফীগনের এমন ভাবাধারার কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে এই গোত্র অতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই প্রথম মুসলিম সূফীগনের যোগসাধনার কথা জানতে পারা যায়। রামানন্দ , কবীর , নানক দাদু প্রমুখ সাধকদের বিখ্যাত বাণী তার সহায়ক হয়েছিল। এই মিলনের ফলে চৈতন্য দেবের হাত ধরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সূফীবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মিলনমেলা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই সংমিশ্রণের ফল থেকেই বাউল সম্প্রদায়েরও উৎপত্তি হয়। চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে দেখা যায় এরা প্রেমিক, এরা মরমী, এরা বিশিষ্ট কোন সমাজ বন্ধন মানে না, কোন ধর্মের অনুশাসন কে গ্রাহ্য করে না এবং এরা উদাসীন গান গেয়ে স্থানান্তরে ঘুরতে থাকে। বাংলায় একাদশ -দ্বাদশ শতাব্দীতে সুফিবাদের আগমন

অগ্রগতিপ্রাপ্ত হয়ে বাউল সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তাকে ত্বরান্বিত করার যে যাত্রা সেখানে সাম্য, প্রেম ও শান্তির পূর্ণ বিকাশের লীলা অধ্যায় তার মোহনায় পৌঁছাল।

সূফী সাধকদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, ভাববাদী, দার্শনিক। জীবন, যৌবন ও কাল সম্বন্ধে তাদের চিন্তা ভাবনা ছিল উচ্চমার্গের। ভারতে প্রবেশ করে সুফীতত্ত্ব ভারতীয় জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু আধ্যাত্মিকতাবাদের সংস্পর্শে এল। ধীরে ধীরে বেদান্ত, উপনিষদ, যোগ-তন্ত্র , প্রকৃতি-পুরুষ ও শাস্ত্র সম্ভারের বিপুল জ্ঞান ভান্ডারের সাথে পরিচয় হল। বিস্তৃত হল তাদের তাদের জ্ঞানজগৎ। চিন্তা চেতনাই ব্যাপ্তির সাথে সাথে দার্শনিক ভাবনা ক্ষেত্র প্রসারিত হলো যার একটি অংশের প্রকাশ হল সাহিত্যচর্চা। জাহিদ বর্ণিত এক সৃষ্ট তত্ত্ব থেকে বাঙ্গালী সূফীদের লক্ষ্য ,সাধ্য ও সাধনা সম্পর্কে ধারণা করা যায় ---

"না ছিল ক্ষিতি জল ই মহি মন্ডল
শূন্য মধ্যে না ছিল প্রকাশ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব ছিল অন্ধকার
আউর না ছিল আকাশ।
চন্দ্র সূর্য তারা না ছিল অভি পরা
না ছিল নবীন জলধর
বাউ বরুন আনল পৃথিবী রসাতল
না ছিল পর্বত শিখর।
নদ-নদী শূন্যাকার না ছিল পাড় ঝঙ্কার
না ছিল সাগর তিখ স্থান
সংসারে না ছিল কিছু সব হৈল তার পিছু
সবেমাত্র ছিল ভগবান।
এক ছিল নিজরূপ কিছু না পাইল সুখ
ভাবিলা প্রভু আপন শরীরে
শূন্যাকার ঘুচাই দৃষ্ট রচিলাত নানা সৃষ্ট
এক খেলা খেলাব সংসারে।...। "[10]

আধুনিককালে রবীন্দ্র ও লালন সাহিত্যেও সূফী দর্শনের এক গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

"যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে ,
অপরুপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে।.
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।" - গীতাঞ্জলিঃ১৪২

"যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা ,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। " - গীতাঞ্জলিঃ১৪৭

"আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে

তারে জনমভর একবার দেখলাম নারে। “ -লালন ফকির

“আমি একদিনও না দেখলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
এক পড়শী বসত করে।
আমি একদিনও না দেখলাম তারে।“ - লালন ফকির

“কাবার কি নিরিখ, নিরূপণ—
নিজের কাবাই নাই অন্বেষণ,
খলিলুল্লার কাবায় কি কখন
খোদাকে কেউ পায় দেখতে।
খলিলুল্লার কাবা রে ভাই
সে কাবা পৌঁছতে হয়।
আদম কাবাই দেখনারে মন , আগে চেয়ে।“ -লালন শিষ্য দুদ্দু

সূফী দর্শনে যাকাত নিয়ে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। শরিয়তী ইসলামে বিষয় ও সম্পত্তি অনুযায়ী ব্যক্তিকে যাকাত দান করতে হয়। কিন্তু বহু সূফীপন্থী ধারা ধনীদের বিষয় সম্পত্তির হেফাজতের জন্য যাকাত কিংবা দরিদ্রদের নিচু হয়ে গ্রহণ পন্থাটিতে বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে যাকাত দাও দেহের। বলেন নফসে আম্মারাকে দমন করার জন্য দেহের যাকাত পরিপূর্ণ আদায় করতে হবে এবং তার প্রাপ্তি পথ হিসেবে নির্দেশ করেন মনের পরিশুদ্ধতাকে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলো জীবন থাকাকালীন বিভিন্ন কাজে পরিচালিত হয়, যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক দ্বারা দেখি, শুনি, অনুভব করি অপরদিকে কর্মেন্দ্রিয়গুলোও বিভিন্ন উদ্যেশ্যে পরিচালনা করি। সূফী সাধকেরা বলেন এই সকল ইন্দ্রিয়কে যখন সুপথে পরিচালিত করতে পারবেন তখন হাকিকী যাকাত আদায় হবে। যেমন চক্ষুকে মন্দ পথ থেকে সুপথে চালনা করতে সক্ষম হলে চোখের যাকাত আদায় হবে, জিহ্বা দিয়ে অশ্লীল, মূল্যহীন বাক্যব্যয় থেকে দূরে থেকে সুপথে চালিত করলে জিহ্বার বা মুখের যাকাত আদায় হবে। হজরত রসূল পাক অর্থাৎ নবী বর্ণনা করেন, ‘মানবদেহে এমন একটি মাংসের টুকরো আছে যা পাক হলে সমস্ত দেহ পাক আর তা যদি নাপাক হয় তবে সমস্ত দেহই নাপাক। তার নাম হল ক্বলব বা অন্তর‘। তাই তারা নিজেকে ক্বলবকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে দেহের হাকিকী যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[14] এই দৃষ্টিভঙ্গি আদর্শবাদী, নৈতিক, সামাজিক মানুষ ও সমাজ তৈরিতে অভাবনীয় কার্যকরী হয়। এমন বহু ক্ষেত্রে সূফী দর্শন সামাজিক সংস্কারের পথ দেখায়। আলী রাজা কানু ফকির জ্ঞান সাগরের রাগ বসন্তে ফকির দরবেশ এর স্বরূপ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন:

“জথ জন শুদ্ধ ফকির প্রধান
জানিব রতন সব মাটির সমান।
রত্ন মাটি সমান পারিলে করিবার
কহিছেন্ত প্রভু সে ফকির হয় সার।
সুগন্ধ দুর্গন্ধ যদি জানে এক সম
সমান জানিলে লোক উত্তম অধম।
নর পরী পশু পক্ষী পতঙ্গ কীটসি
সকল সমান জানে তবে সে দর্বেশী।

জগত সমান এক জানে জে বুঝিতে
সে সকল পারে তবে দর্বেশ হইতে'।
তিন লোক পালে গালে এক করতারে
এক প্রভু সেবে জপে সর্বজীব ….।"

এরূপ সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে সূফী,ফকির ও দরবেশরা তাদের দর্শন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মানবকুলের উদ্দেশ্যে বিধান দিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ধারার গঠনের সাথে যোগ কালান্দার, তালিবনামা, সুরনামা, নূরনামা ও জ্ঞানসাগর প্রভৃতির ব্যাপক সাদৃশ্য দেখা যায়। বঙ্গীয় সূফী সংস্কৃতিতে গান-বাজনার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বঙ্গে জনপ্রিয় হওয়া মাদারি গোষ্ঠী সুসজ্জিত করা একটি বাঁশকে একজন মানুষ নাচাতে থাকতেন অপরজন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকতেন। এই প্রথা সাংস্কৃতিক অংশ হয়ে ব্যাপকতা লাভ করে এবং বহুকাল বাংলায় চলে আসছে। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বাংলার গভর্নর হলে তিনি মাদারি সিলসিলাহতে একটি সনদ দান করেন, রাজশাহী শহরে তা সংরক্ষিত আছে। চিশতি ও সুরাবর্দি সম্প্রদায় ভুক্ত সাধকদের মধ্যে গান-বাজনা একটি অপরিহার্য বিষয় ছিল। তারা গান বাজনার সাথে আধ্যাত্মভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। সূফীদের মাধ্যমেই বাঙালি জীবনে এইরূপ গান বাজনার (সামা) প্রথম পরিচয় মেলে। বাবা শাহ আলীর মাজার প্রাঙ্গণে ভক্তিমূলক গান ও বাবার জীবনকে কেন্দ্র করে মারফতি গান মিরপুরের ঐতিহ্য বহন করে। যেমন-

"শাহালি বাবা আল্লাহর আউলিয়া
বাবা , মিরপুরে আছো তুমি ঘুমাইয়া
মুর্শিদ মওলা নামটি তোমার
শাহ আলী নামটি তোমার।"[1 1]

--বেশ জনপ্রিয়। এছাড়াও এপ্রসঙ্গে সুফীদের ভক্তি সঙ্গীত কাওয়ালি সঙ্গীতের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখেনা। কাওয়ালি শব্দটি আরবি শব্দ 'কৌল' বা 'কৌলুন' থেকে এসেছে যার অর্থ বাক্য। বহুবচনে শব্দটি হয় কাওয়ালি। যারা কাওয়ালি গান করেন তারা কাওয়াল হিসাবে পরিচিত। কাওয়ালরা তাদের শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক ভাবে ভাসানোর জন্য তাদের দৃষ্টি দর্শনকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করেন মানবমনকে ঈশ্বর বা আল্লাহমুখী করে তোলার প্রবণতা দেখা যায় কাওয়ালি সঙ্গীত। আমরা আজ যে কাওয়ালির রূপ শুনি তা বহুমুখী কবি সঙ্গীতজ্ঞ আমির খসরু (১২৫৩ - ১৩২৫ খ্রিঃ) দ্বারা উদ্ভাবিত বলে বিশ্বাস করা হয়। তিনি সেতার এবং তবলা আবিষ্কার করেছিলেন বলেও অনেকে মনে করেন। তিনি দিল্লির সুফি ওস্তাদ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এই বিশেষ সঙ্গীত সাধারণত অতীতের সুফি গুরুর মাজারে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে যুক্ত হয়েছিল।। এই সঙ্গীতের , মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। হযরত মাহবুবে এলাহীর দরবার শরীফে কাওয়ালি গানের জনপ্রিয়তা ছিল। সাম্প্রতিককালের কাওয়ালি কনসার্টে আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব হলেও আজ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে কাওয়ালি গান সমাদৃত হয়েছে। সুফিরা জ্ঞানের চাইতে উচ্চ আসন দিয়েছেন উপলব্ধিকে এবং হৃদয়কে নির্দেশ করেছেন উপলব্ধির আধার হিসাবে। চিরাচরিত সংস্কারের উপরে বিচরণকারী সূফী সাধক আনসারির ভাষায় ----------

"দর রাহে খোদা দু কবহ আমদ হা মিল।
য়েক কবহ ই সুরত অস্ত থেক কবহ ই দিল।।
তা, বে তবানি জিয়ারত ই দিলহা কুন।
কফ জুন জ হজার কবহ আমদ য়েক দিল।। "

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে সূফীবাদ ও তার ধারক ও বাহকেরা বাংলা তথা ভারতের সমাজ জীবনে বিবিধ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজ গঠনের বহু মূল্যবান উপাদান সূফীবাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। বাংলায় জ্ঞানীগুনী সূফীদের আগমন বাংলার ধর্মীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায় যোগ করে।

সূফী সাধকদের খানকাহ ও মাজার গুলিকে কেন্দ্র করে তাদের তরীকতে অনুগামীদের দ্বারা আজও পর্যন্ত জনমুখী কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। যতদিন না পৃথিবীর অন্ত হবে, ঠিক ততদিন এই মুক্ত মহান ভাবনার মুরিদদের অভাব হবেনা।

"যে পেয়েছে প্রাপ্তিযোগ উড়ন্ত জীবন
সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেমন।"[1 2]

তথ্যসূত্র:

1. A Friedlander, Walter, Z Apte, Robert, 'Introduction to social Welfare', Berkeley, 1980, pp- 3
2. Haq, Muhammad Enamul, "A History of Sufism in Bengal ", Dhaka, 1975, pp- 52
3. Zaheer, Dr Khalid," Does the Quran say that man is Ashraful Makhluqat ", Central Punjab, 2019
4. আহমদ , ওয়াকিল , " বাংলার সূফী পির-দরবেশ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য " কলকাতা , ২০২০ ,পৃষ্ঠা ১১৮
5. O'Malley, L.S.S, "Bengal District Gazetteer", New Delhi, 1910, pp 101- 116
6. আল মান্নান, আবদুল্লাহ মামুন আরি ," ফুরফুরার ইতিহাস" ঢাকা, ১২১৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬১
7. Karim, Abdul, "Social History of the Muslim in Bengal "Dacca, 1959, pp- 400-426
8. Eton, Richard M, "The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204-1760, Berkeley, 1993
9. Nizami, S Haque; Haq katshu, Md Ziaul; Uvais, N.A, "Sufism and Mental health "Indian journal of psychiatry, 2020
10. শরীফ, আহমদ,"বাংলার সূফী সাহিত্য"কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫
11. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৩
12. গনী, ড ওসমান, "ইসলাম ও সুফীসমাজ" কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৫৫
13. Al Hujwiri, Hazrat Ali Bin Usman, Trans Anicholson, Reynold, "The Kashf Al Mahjub ", Lahore, 2001, PP 89-100
14. সুফি সাধক সম্রাট, ২০১৮,"সুফি দর্শনে হাকিকি যাকাত", ২০ অক্টোবর, ২০২২, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dQqB6E8rtpnMddqrKZrqYDPnAWPLqEUYUEC3JLnCiMHAR1WAtgQTiqnuTh6JgRl&id=1466124003475738
15. Rajyasabha Snsad TV, Indian History congress, "Emerge of sufi traditions and its contribution to syncretie Fabric of India", 2014, https://youtu.be/Y2CdcRY47cM
16. Sahapedia, "Sufism in Bengal and Bangla Quwwali In conversation with Dr. Md. Sajjad Alam Rizvi ", 2018, https://youtu.be/1HkV-kjatFI

সহায়ক গ্রন্থ:

১। মহম্মদ এনামুল হক, "বঙ্গে সুফী প্রভাব " কলকাতা, ২০০৬
২। প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, "বঙ্গে সুফি প্রভাব ও সুফিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ", ঢাকা ২০১৮